ATHENA, VOLUME VII, JULY 2023 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 174–181
www.athenajournalcbm.in

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও বিংশ শতকে বাঙালীর পরিবার ভাবনা

ডম্বরুপাণি ভট্টাচার্য্য*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২৩ পরিমার্জন: ২৩/০৩/২০২৩ গৃহীত: ৩০/০৩/২০২৩

সারসংক্ষেপ: *প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য তাঁর গ্রন্থ 'The Defining Moments in Bengal' (1920-1947)-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিঙ্গ প্রসঙ্গ (Gender Question) ও নতুন ভদ্রমহিলা (New Bhadra Mahila) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীতেও কিছু সাধারণ বা প্রাথমিক ধারণা যেমন— সতীত্ব (Chastity of Women), গাহস্থ্য ধর্ম (household tegimen of duties), বৈধব্য ধর্ম (duties of widowhood), নারী শিক্ষা (womens' education), অধিকার (right or realm, according to the context), প্রেম (love)[১] ইত্যাদির নিরিখে ভদ্রমহিলা বা নারীর (সাধারণ অর্থে) সত্তা বা অবস্থানকে যে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিচার্য হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, তা হল শিক্ষিত ভদ্রলোক পরিবার। পরিবার এই সামাজিক ক্ষুদ্র একক বহুস্তরীয় সমাজকাঠামো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানে সম্পৃক্ত করে তুলেছে সভ্যতার শুরুর দিন থেকেই। কিন্তু এই আলোচনায় পরিবারকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার একটি বিশেষ কারণ আছে, তা হল পরিবারতন্ত্রের এক অনন্য চালিকাশক্তি নারীর চোখে বিষয়টিকে তুলে ধরা। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অস্তিত্ব পুরুষের সমসাময়িক হলেও তাদের আত্মপ্রকাশ বহু পরে। আধুনিক সমাজেও এইসব অশ্রুত কণ্ঠস্বর মহফেজখানা, সরকারি দলিল প্রভৃতি চিরাচরিত উপাদানের মধ্যে তেমনভাবে পাওয়া যায় না; সাহিত্যিক উপাদান সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করে। আলোচ্য নিবন্ধে এমনই এক সাহিত্যিক উপাদানকে বেছে নেওয়া হয়েছে আলোচনার তাগিদেই, তা হল আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'।*

সূচক শব্দ: *পরিবার, বিবাহ বন্ধন, বাঙালী ভদ্রমহিলা, মহিলা লেখিকা, আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ।
e-mail: damrupani25@gmail.com

'পরিবার' বলতে আমরা বর্তমানে যে ধারণা পোষণ করি, সেই ধারণা শুধুমাত্র উনিশ শতকেই নয়, বিংশ শতকের মধ্যভাগেও বেশ বেমানান। কারণ, বাঙালী সমাজকাঠামোয় পরিবার ব্যাপারটি দীর্ঘকাল ধরেই তার নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। সেই 'পরিবার' আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। সেখানে মেয়েরা ছিলেন প্রথম থেকেই, কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল পরিবারের অলিন্দে, অন্দরমহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোটামুটিভাবে ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামো যখন ভারতীয় তথা বাংলার সমাজকে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে, অর্থাৎ, উনিশ শতকের কথা যদি ধরি, তাহলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন বাংলার সমাজ মোটামুটি অবস্থানগতভাবে গ্রাম ও আধুনিক শহর এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। তাই পরিবারও দুই স্থানিক অবস্থানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল। সাহিত্যিক উপাদানকে ভিত্তি করে এই গবেষণাপত্রে মূলত শহরকেন্দ্রিক সমাজকাঠামোয় পরিবারের অবস্থান ও সেই পরিবার কীভাবে নারীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বা নারীর নিজস্ব অস্তিত্ব কীভাবে পরিবারে কতখানি স্থান নিয়েছিল, সেই দিকে আলোকপাতে সচেষ্ট হব।

আলোচনার প্রথমেই আসি 'পরিবার' শব্দটির ব্যাখ্যায়। 'পরিবার' বলতে আমরা কী বুঝি? ফেডারিক এঞ্জেলস্ ১৮৮৪ সালে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'The Origin of the Family, Private Property and the State'-এ 'পরিবার' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 'Family' বা 'পরিবার' বলতে মূলত তিন ধরণের সামাজিক বন্ধনকে বুঝিয়েছেন; সেগুলি যথাক্রমে— The Consanguine Family: The first stage of the family, The Punaluan Family, এবং The Pairing Family। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা মূলত ইউরোপের পরিবেশে লেখা হলেও, আদিম জনজাতিগুলির মধ্যে 'Family'-এর ধারণা বিভিন্ন দেশ-কালে কেমন ছিল সেটার একটা চিত্র এর মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষ তথা বাংলার নিরিখে এই ব্যাখ্যা ততখানি যুক্তিযুক্ত হয় না বলে মনে হয়। এঞ্জেলস 'পরিবার'-এর গঠনগত উপকরণ বিবাহ ব্যবস্থাকে নিয়ে লিখেছেন যে কীভাবে বিবাহ পরিবার গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টা এক নয়। কারণ ভারতবর্ষে পলিগ্যামী বা 'বহুবিবাহ'-এর প্রচলন ছিল ঠিকই, কিন্তু সে রীতি প্রচলিত ছিল এক বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে। তবে এঞ্জেলস্-এর এই ব্যাখ্যা সকল সমাজব্যবস্থার কোনো না কোনো অংশে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'Family' শব্দটি যে অর্থে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে— 'The family (says Morgan) represents an active principle. It is never stationary, but advances from a lower to a higher form as society advances from a lower to higher condition… systems of consanguinity, on the contrary, are passive, recording the progress made by the family at long intervals apart and only changing radically when the family has radically changed'.[২] অর্থাৎ, পরিবার একটি সক্রিয় নীতির প্রতিভূ। এই পরিবার কখনই এক অবস্থায় স্থির নয়, সমাজের ন্যায় এটিও নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, বলা যেতে পারে, উভয়ই সগোত্রীয় ব্যবস্থা; আবার বিপরীত দিক থেকে ভাবলে, পরিবারের উন্নয়ন মূলত একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং সমাজের পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিবারের পরিবর্তন বা উন্নয়নের ওপরেই নির্ভর করে।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় এটি আংশিকভাবে সত্য হলেও কাঠামোগত দিক থেকে 'পরিবার' শব্দটি অনেকখানি গভীর। কারণ 'পরিবার' শব্দের মধ্যে একটা মায়া, আবেগ-এর বন্ধন থাকে যেটা 'Family'-র পাশ্চাত্য ব্যাখ্যানে সেইভাবে পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন বাড়ি শব্দটি ঘর-এর প্রতিশব্দ হতে পারে না বা 'House' ও 'Home' শব্দ দুটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি 'Family'-এই ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'পরিবার' একার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

আলোচনার শুরুতেই আমরা একথা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে, পরিবার সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম একক। তাই, অবশ্যম্ভাবীরূপেই সামাজিক পরিবর্তন সবসময়ই প্রতি এককে তার প্রভাব রেখে যায়। বাংলার সামাজিক আদলেও তার অন্যথা হয়নি। আমাদের আলোচনার মুখ্য সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতক। এই সুদীর্ঘ দুই শতক বাংলা তথা ভারতের আধুনিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ সময়কাল। পরিবর্তন তো বটেই, পরিবর্ধন ও পরিসমাপ্তির

এক বিশাল কর্মকাণ্ডের দলিল হল এই দুই শতক। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রামকেন্দ্রিক সমাজকাঠামো ধীরে ধীরে যখন শহরমুখী হয়ে উঠেছিল, তখন গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়েছিল। আবার অন্যদিকে শহুরে 'মেস' বা 'বাসা'র জীবন শুরু হয়েছিল। এই পরিবর্তনের সূচনা অনেকখানি ঔপনিবেশিক কলকাতার জন্মের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী শহর, তাই শিক্ষা থেকে কর্ম সকল কিছুর আধার হয়ে উঠেছিল এই কলকাতা। তাছাড়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী ব্যবস্থার যে পরিবর্তন আসে যার ফলশ্রুতিতে পুরাতন জমিদারের অনেকেই তাদের জমিদারী হারালেও আভিজাত্য হারাতে আরও একটু সময় লেগে যায়। সেই পুরাতন জমিদারদের স্থানে একশ্রেণীর ভূমিফোঁড় মানুষ, যাদের মুখ্য চরিত্র মুৎসুদ্দি, তারা একাধারে জমিদারীর হাল ধরে ও শহরে বসবাস করতে শুরু করে, এরা সকলের কাছে 'Absentee Landlords' বা অনুপস্থিত জমিদার হিসাবে পরিচিত হয়েছিল, যাদের অনেকেই পরবর্তীকালে 'বাবু' উপাধি নিয়ে ইংরেজদের তোষণে মত্ত হয়েছিল।

সামাজিক এই পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায়। বহু কৃষক কৃষিজমি হারিয়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। জীবন-জীবিকার সন্ধানে তারা শহর ও তার সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে যোগ দেয়। ফলে গ্রামীণ যে পরিবারতন্ত্র তা ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে। দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে পুরুষেরা পরিবারের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা বা আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকতে থাকতে একধরণের একাকিত্ব তাদের জীবনকে গ্রাস করতে শুরু করে। এই একাকিত্ব দূর করতে তারা বিকল্পের সন্ধান করতে থাকে। বিকল্প পথ হিসাবে 'মেস'-জীবন তাদের 'দ্বিতীয় পরিবার' হয়ে ওঠে।

তবে সমাজের এই অংশকে বাদও যদি দেওয়া হয়, তাহলেও যারা নিজেদের পরিবার নিয়ে বিভিন্ন সময় কলকাতায় আশ্রয় নেন, তাদের ক্ষেত্রে পরিবার আবার একটা বোঝা হিসাবে প্রতিপন্ন হতে শুরু করে। দৈনন্দিন জীবনের অভাব এই সকল কেরানী সমাজকে ক্রমশ যান্ত্রিক ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকের রচনায় আমরা এইরূপ দৈন-জীবনযাপনের ইতিহাস পেয়ে থাকি। বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙালীরা অর্থ উপার্জনের জন্য বার্মাতে চাকরী নিয়ে ক্রমাগত চলে গিয়েছিল, তখন দেশে পড়ে থাকা তাদের পরিবারের অসহায়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' সিরিজ এর প্রকৃষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়, যেমন— মহামারি, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তো সামাজিক সকল সমীকরণই বদলে দিয়েছে বারে বারে। একদিকে যখন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিড়িক দেখা যায়, পাশাপাশি ঠিক একইভাবে বিভিন্ন মহামারির প্রাদুর্ভাবও লক্ষ্য করা যায়। ৭৬-এর মন্বন্তর, প্লেগ, বসন্তরোগ ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আসলে এই সকল কিছুর প্রভাব গিয়ে পড়ে ওই 'পরিবার' নামক ক্ষুদ্র সামাজিক এককটির ওপর। কারণ 'পরিবার' সমাজের বাইরে বিস্তৃত স্বতন্ত্র জগৎ নয়।

এ তো গেল 'পরিবার' শব্দের বাহ্যিক দিক, কিন্তু পরিবারের গঠনগত দিকের একক হল পরিবারের মানুষেরা এবং তাদের মধ্যের পারস্পারিক সম্পর্ক। একথা সত্য যে, এই 'পরিবার' হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর প্রতিরূপ। তাই, প্রতিটি পরিবারের মধ্যেই আমরা একটা 'পরম্পরা' খুঁজে পাই। প্রতিটি বাঙালী পরিবার মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, বাহিরমহল ও অন্দরমহল। বাহিরমহলের সঙ্গে সরাসরি পুরুষসমাজের ওঠা বসা ছিল। আর অন্দরমহল ছিল মহিলাদের অধিকারে। তবে সেখানেও 'পরম্পরা' বজায় ছিল, যা আমরা সাধারণত 'শাশুড়ি-বৌমা'র সম্পর্কের মধ্যে খুঁজে পাই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সকল কিছুর পৌরোহিত্য করে থাকেন 'শাশুড়ি' পদাধিকারিণী, যিনি আদতে কিন্তু একজন মহিলা। অথচ তিনি বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রয়োগে সাধারণত ব্যস্ত থাকেন এবং একটা অদ্ভুত 'অধীনতার সূত্র' কার্যকরী করার প্রবণতা পরিবারের অন্দর চরিত্রে চলতে থাকে।

উনিশ-শতকে যখন 'স্ত্রীশিক্ষা' নিয়ে পুরোদমে আলোচনা চলেছিল, তখনো আমরা দেখতে পাই বিভিন্নভাবে

মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়টি মহিলারাও বিরোধিতা করেছিলেন। এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম-মহিলাদের কথা উল্লেখ্য, তাঁরা মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে হলেও শিক্ষাকে বা শিক্ষানীতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে চেয়েছিলেন। এই সময় থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ‘মেয়েদের কী করণীয়’ সেই বিষয়ে নানান প্রবন্ধ একটি দীর্ঘ সময়কাল ধরেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। প্রথমদিকে পুরুষরা লিখলেও পরবর্তীকালে মহিলারাও সমভাবে এই সকল পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তাদের মতামত দান করতে শুরু করে। ‘অন্তঃপুর’, ‘তত্ত্ববোধিনী’, ‘পরিচারিকা’, ‘বঙ্গমহিলা’, ‘বামাবোধিনী’ ইত্যাদি তো রয়েছেই, তাছাড়া ‘ভারত-মহিলা’, ‘মহিলা’ বা ‘সাধারণী’র মত বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় মহিলা লেখিকাদের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল— পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। কারণ, দীর্ঘদিন অন্দরমহলে থাকার ফলে ও সামাজিক পরিকাঠামোর জন্যও তাঁদের লেখনীর মধ্যে অনেকসময় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠার মত বিষয়গুলিতে একটা জিজ্ঞাসা কাজ করত ও তাঁরাও অনেকেই পারিবারিক সেই সীমানাকে লঙ্ঘন করতে চাইতেন না। তাই অনেক সংশয়ই এই সকল লেখাগুলির মধ্যে আমরা খুঁজে পাই।

সুতরাং, এইরূপ এক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ‘পরিবার’ ও ‘নারীসত্তা’ এই বিষয়টিকে নতুন করে দেখার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়। উদ্দেশ্যটি হল— আজ যখন আমরা নারীসত্তা নিয়ে এত আলোচনা করি এবং তাকে বিনির্মাণ করার পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করি, তখন কোথাও গিয়ে আলোচনাটির গুরুত্ব একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই এক ‘স্ত্রীশিক্ষা’, ‘স্ত্রীপর্ব’ ও ‘সামাজিক বোঝা’ থেকে সামাজিক দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাতেই সীমিত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা তেমনভাবে কখনোই বুঝতে চেষ্টা করি না, যে, কেন ও কী কারণে নারীর সত্তা নিজের অস্তিত্বকে সার্বিকভাবে প্রকাশ করতে এত কাল অপেক্ষা করল। সেক্ষেত্রে শিক্ষাই কী একমাত্র প্রতিবন্ধকতা ছিল তাঁদের কাছে? তাঁরা শিক্ষিত না হওয়ার জন্য অর্থাৎ, লিখিত আকারে মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম তাঁদের জানা ছিল না? নাকি অন্যান্যদের মতো একটি বিকল্প জগতের সন্ধান তাঁদের কাছেও ছিল? ‘De-coding’-এর অভাবে আমরা সঠিকভাবে এ সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হই না। একারণেই আমাদের সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ কোনোরূপ সরকারি খতিয়ানে কোনোভাবেই এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট হয় নি। যেটুকু যা পাওয়া যায়, তা সবই পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন-এর ভিত্তিতে অনুধাবন করতে হয়। তাই আমাদের এই ইতিহাস জানতে অনেক বেশিমাত্রায় সাহিত্য নির্ভর হতে হয়। বলা যায় ‘সাহিত্যিকের কাছাকাছি’ হয়ে উঠতে পারলে হয়তো খানিকটা উপলব্ধি করা সম্ভবপর হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের একাধিক ধারার মধ্যে উপন্যাস হল অনেক বেশি নবীন একটি ধারা। উপন্যাসের ব্যাপ্তিও অনেক বেশি পরিণত। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যে সকল বৈশিষ্ট্যর কথা এখন বলা হয়, তা উনিশ-শতকের মধ্যভাগ কেন, বিংশ শতাব্দীর একটা বড় অংশেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে একটা শব্দবন্ধ সাধারণত ব্যবহৃত হয়, তা হল ‘আখ্যায়িকা’ বা ‘Novella’। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যাত্রাপথ আখ্যায়িকা থেকেই শুরু হয়। ১৮৫২ সালে প্রথম প্রকাশ পায় হ্যানা মুলেন্স-এর ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ যাতে গ্রামসমাজের বর্ণনা রয়েছে। গ্রামকেন্দ্রিক হতদরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষের চিত্র পাওয়া যায়। যেখানে পরিবার ও তার সুখ সবই নির্ধারিত ছিল অর্থনীতি ও খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা। মহিলা চরিত্রই এক্ষেত্রে মুখ্য হলেও মর্যাদার দিক থেকে তা নয়, সামাজিক চিত্র বর্ণনায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে। মনে রাখতে হবে সময়টা ১৮৫২ সাল, কলকাতায় তখনো ঠিকভাবে শহুরে সমাজটা গড়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু তা ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্ফুটিত করেছে। গল্পের মধ্যে ‘ফুলমণি’র বাড়ির লোক কলকাতায় কাজ করে, কিন্তু তার পরিবার থাকে গ্রামে। এই সময় থেকেই গ্রামীণ যৌথপরিবার ধীরে ধীরে ভাঙে, আবার শহরে নতুন করে অনেকক্ষেত্রে একসাথে থাকার তাগিদ গড়ে উঠতেও দেখা যায়। এর ঠিক পরেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পায় উপন্যাস ‘মনোত্তমা’। ‘হিন্দুকুলকামিনী’ নাম ব্যবহার করেছেন লেখিকা। ফলে স্পষ্ট কোনো নাম এক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব হয় নি। ‘মনোত্তমা’-র বিষয় কিন্তু শহরের একটা সমীকরণ। ‘মনোত্তমা’-র পরিবার বলতে তার স্বামী নীলব্রতকে ঘিরে শুরু হলেও অতিরিক্ত পতিব্রতা তার জীবনকে সমস্যার সম্মুখীন করে তোলে। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ ও লাম্পট্য পরিবারের ভিতরটাকে একবারে ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে

দিয়েছিল। এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য যে তখনো মেয়েরা নিজ নামে গ্রন্থ মুদ্রণ করতে কুণ্ঠিত বা তাদের আত্মসত্তা তখনো প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। ‘মনোত্তমা’-র ঠিক পরপর হেমাঙ্গিনী দেবীর উপন্যাস ‘মনোরমা’ প্রকাশ পায় (১৮৭৪)। গ্রাম-শহর মিলিয়ে এর সমীকরণ। পরিবারের চিত্র সেই অর্থে এখানে পাওয়া না গেলেও পতিব্রতা নারীর একটি চিত্র এখানে পাওয়া যায় এবং স্বামীর প্রতি তার (মনোরমা) ভক্তি তাকে গোরকপুর বা অজানা স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল স্বামীকে কারামুক্ত করার জন্য। আখ্যায়িকার আখ্যানপত্রে আমরা এই রচনার উদ্দেশ্য লিখিত আকারে পাই— ‘সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র স্ত্রীজাতি দ্বারা সংসারাশ্রম কিরূপ সুখের স্থান হয় তদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত’।[৩] অর্থাৎ, ‘পরিবার’ শব্দটি হয়তো ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু ‘সংসার’ শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সেই পারিবারিক সুখের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বলিষ্ঠ লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম পাওয়া যায়; যিনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন’দিদি। জন্মসূত্রে তিনি যতখানি বাইরের জগত দেখতে সুযোগ পেয়েছিলেন, ততখানি উনবিংশ বা বিংশশতাব্দীর মহিলা লেখিকাদের অনেকেরই ছিল না। তাই তাঁর রচনার ব্যাপ্তি অনেকখানি। লেখিকা হিসেবে সাফল্যও অনেক বেশি। তিনি কেবলমাত্র লেখালেখির জগতে খ্যাত ছিলেন না, তাঁর সামাজিক কর্মক্ষেত্র মেয়েদের অবস্থানগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেকখানি ছিল। ‘সখী সমিতি’র মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও ‘স্ত্রী’-জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়াস তিনি চালান। কেবলমাত্র কাল্পনিক গদ্যরচনায় নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন। তাই শিকড়ের টান তাঁর উপন্যাসে অনেকখানি। আর এই শিকড়ের টানই উপন্যাসগুলিকে প্রচ্ছন্নভাবে সামাজিক ইতিহাস গঠনের উপাদানে পরিণত করেছে। যা নারীর যে নিজস্ব জগৎ-চিন্তা-অস্তিত্বকে সমাজের নিরিখে বুঝতে সহায়তা করেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

এদিক থেকে দেখতে গেলে আশাপূর্ণা দেবীর রচনা বাংলা সাহিত্য তথা সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাঁর রচনার বাঁধন যেমন সাধারণ পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তেমনই গবেষক মনেও আগ্রহ জন্মায় তাঁর রচনার প্রতি। তাঁর লেখনী নারীর জগতকে অনেকখানি তুলে ধরে ছিল, তাঁর ‘ট্রিলজি’র অপূর্ব বাঁধনের মাধ্যমে। এখানে সেই তিন উপন্যাসের প্রথম উপন্যাসকেই বেছে নেওয়া হয়েছে আলোচনার স্বার্থে।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনায় লিখেছেন— “বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগতকালের ইতিহাস! আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সামাজিক মানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের এই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।

তুচ্ছ দৈনন্দিনের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই ছবি যদি বহন করে রাখতে পেরে থাকে বিগত কালের সামান্যতম একটি টুকরোকে, সেইটুকুই হবে আমার শ্রমের সার্থকতা। লেখিকা”।[৪]

‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের প্রথমাংশের সূচনাতে একথাই লিখেছেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “তাঁর শিল্পসৃষ্টি তাঁরই স্বীকৃত চেষ্টার ফসল। আক্ষরিক অর্থে তিনি বিদুষী নন, কোনো ছোট-বড় বিদ্যায়তনে তাঁর শিক্ষা লাভ ঘটেনি, বালিকা বয়সে বেনী দুলিয়ে কোনো স্কুলে যান নি, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে হিলতোলা জুতোয় খটখট শব্দ তুলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দে সাহিত্য-শিল্প রাজনীতি নিয়ে গোষ্ঠীতর্কের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে চায়ের কাপে তুফান তোলেন নি। বাল্য বয়সে বিবাহের পর মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রবেশ করেন। সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর পরিচিত জগৎ, যাকে প্রত্যক্ষ করেছেন দৃষ্টি ও শ্রুতির সাহায্যে। কিন্তু আরও একটা জগৎ আছে, যা তৃতীয় নয়নের অপেক্ষা রাখে। ধূর্জটীর তৃতীয় নয়নের মতো তা অপ্রত্যক্ষকে

প্রত্যক্ষ করতে পারে, যা ঘটে নি তাও ঘটাতে পারে। জানালার ফাঁক ফোকর থেকে যতটুকু দেখা যায় শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে তাই যথেষ্ট। সারাদিন গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও তিনি মনের জগতে একাকী বিচরণ করেছেন, অধরা অপ্রাপনীয়াকে খাতার পাতায় ধরে রেখেছেন। বাইরের জগতে পদপাত করেন নি, কিন্তু মনের আয়নায় ভিতর-বাইরের ব্যবধান ঘুচিয়েছেন"।[৫]

আশাপূর্ণা'র গল্পের প্লট গঠন যে সর্বত্র নিখুঁত আঁটসাঁট তা বলা যাবে না। কারণ তিনি গল্প লেখেন নি, গল্প বলেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে যেন কোনো কথক ঠাকুর লুকিয়ে আছে, অথবা ঠানদিদি। সমসাময়িকী সমাজ, নরনারী, বিশেষতঃ, অন্তঃপুরিকাদের অনুক্ত জীবন ও দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি, উপর মহল ও নিচের মহলের জীবন্ত চিত্র, ঘরগৃহস্থালী থেকে তাস-পাশার আড্ডায় উত্তরণ, বৈঠকখানা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। গল্পের গঠনশৈলী সহজ ও সরলরৈখিক, অত্যাধুনিক কলাকৃতির দুঃসাধ্য ব্যায়াম তাঁর গল্পে প্রায় অনুপস্থিত।

"১৯৬০ সাল থেকে যে ঝরনা ধারার প্রাবল্যে উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য রচনার জোয়ার শুরু হয় তা আর স্তিমিত হয়নি। ৬০ থেকে ৭০ —এই দশ বছরে বাষট্টিখানা উপন্যাস তাঁর প্রকাশিত হয় যার প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টি— ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। এই দশকও ছাড়িয়ে রচনার স্রোত বয়ে চলেছিল সমান তালে, সমান চাহিদায়। ১৯৭৪-এ প্রকাশিত হল ট্রিলজির শেষ খণ্ড 'বকুল কথা' মধ্যে 'সুবর্ণলতা' ১৯৬৭ সালে। সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল —এরা প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের শুরু —এই তিন কালকে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ভাঙা গড়াকে যেন তুলে ধরেছে"।[৬] যে সত্যবতী প্রশ্ন রেখেছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে, যা সে চেয়েছে সমাজের কাছে অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্য, তারই সার্থক প্রতীক যেন হয়ে উঠেছে বকুল। হয়তো নিজেকে শনাক্ত করার মঞ্চ সে তৈরি করতে পেরেছে। নারী মনের এই বিবর্তন, তার অধিকার অর্জনের সংঘাত যেন আশাপূর্ণা'র নিজেরই আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মনিরীক্ষণের ফল, যা এইসব চরিত্রগুলির আদর্শে বাহিত হয়ে এসেছে।

এবার একটু উপন্যাসে প্রবেশ করে দেখা যাক। ট্রিলজি বা উপন্যাস 'ত্রয়ী' আসলে একটি পরম্পরা। একটি আত্মকথন যেখানে পূর্বপুরুষের স্মৃতিচারণ ও তাদের লব্ধ আত্মোপলব্ধি উঠে আসছে বকুলের খাতার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, লেখিকা এখানে অতীতে যাচ্ছেন বর্তমানকে আশ্রয় করে। তাই তিনি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সূচনাতেই বলেছিলেন, "সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া। বকুল বলেছিল, একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও সত্যি"।[৭] আসলে এটা তার মাতামহীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। তৎকালীন সমাজে মহিলা জাতির উপর যে নিপীড়ন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং সেই পরিবেশেও যে প্রিয়পরিজনদের আনুকুল্যে আশাপূর্ণা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হতে পেরেছিলেন, এই দুই পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতির সংঘাতই তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রভৃতি উপন্যাস রচনায় শক্তি জুগিয়েছিল। তাঁর নারী-স্বাধীনতার আকাঙ্খা-রূপে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও তৎপরবর্তী উপন্যাসগুলি।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতী। সত্যবতীর কিশোরী জীবনের হাত ধরে উপন্যাসের শুরু বলা যায়। তবে তার আগে সত্যবতীর পিতা রামকালীর চরিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। রামকালীর উপাখ্যানটি এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি বলা চলে। সুচিকিৎসক রামকালীর আদুরে মেয়ে সত্যবতী। পিতার জন্যই সত্যবতী একটু স্বাধীনচেতা, ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং নিজমত ব্যক্ত করতে ভয় পায় না। কিন্তু রামকালীর একান্নবর্তী সংসারে বিধবা পিসি মোক্ষদার প্রবল প্রতাপ প্রতিপত্তি। শুচিবাইগ্রস্ত। কঠিনচেতা রমণী। কিন্তু তাঁর শাসনও অন্যায় বুঝলে সত্যবতী গ্রাহ্য করতো না। এই অতি-স্বাধীন মেয়েটিকে নিয়ে রামকালী ভবিষ্যতে বিপদে পড়বেন এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে বাধে নি মোক্ষদার। সুচিকিৎসক রামকালী একদিন একটি বরযাত্রীর দলে পালকির মধ্যে বরকে দেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং বরের চেহারায় ঘোর সান্নিপাতিকের আক্রমণ, মৃত্যু আসন্ন দেখলেন, কিন্তু পল্লীর এককন্যার বিবাহ বন্ধ হলে পরিবারটি তদানীন্তন সামাজিক প্রথায় ঘোর অসুবিধায় পড়বে এই ভেবে নিজের বিবাহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে ঐ কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। সদ্য বিবাহিত বধূর জীবনে সতীন আনবার মর্ম যন্ত্রণা বোঝাবার মত মন সেকালের সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে রামকালীর মত

বিবেচক মানুষেরও ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাটি সত্যবতীর মনে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। নারীর স্বাধিকার প্রচেষ্টার ইচ্ছা বা বোধ সত্যবতীর সেই বাল্যকাল থেকেই জন্ম নিয়েছিল। সেকালে মহিলাদের লেখাপড়া শেখা পাপ বলে মনে করা হত। সেকালে জন্মে সত্যবতী প্রায় জোর করেই লেখাপড়া শিখেছিল। এই অধিকার তার অর্জিত। এরকম বোধ নিয়ে যে জন্ম গ্রহণ করে, অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করতেই যেন তার জন্ম, তেমন মানুষ বিশেষ করে মহিলা হলে তার জীবনের পরিণতি কখনই সুখের হতে পারে না। যে সামাজিক পরিস্থিতিতে রামকালী ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দিতে পারেন, তারই প্রভাবে নিজের মনের মতো গড়া সত্যবতীকে বাল্যবিবাহ দিয়ে অল্প বয়সেই শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে বাধ্য হন। সংসারের নিয়মেই যেন সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি সত্যবতীর ধ্যান-ধারণার বিপরীত মূর্তি দিয়ে তৈরি ছিল। উন্নত সচ্চরিত্র মহিমাময় পিতার বিপরীত চিত্র সত্যবতীর শ্বশুর। শ্লথ চরিত্র মানুষটি যখন বাইরে রাত কাটিয়ে ঘরে ফেরেন, তখন পূজার্চনা করলেও সকাল বেলায় তার পায়ের ধুলো নিতে তার প্রবৃত্তি হত না, একথা সত্যবতীর মতো মেয়েরাই স্পষ্ট করেই বলেছিল। যে শক্তিতে সত্যবতী শ্বশুরবাড়ির সব বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই শক্তির জোরেই সত্যবতী স্বামী নবকুমারকে নিজে কলকাতায় বাসাবাড়ি করতে বলেছিল, নবকুমারকে কাজ করে উপার্জনের মাহাত্ম্য বোঝানো, পৈতৃক বিষয়ের উপর ভরসা করে বসে খাওয়ার মধ্যে কোনো পুরুষত্ব নেই সে বোধ জাগানো, ছেলেমেয়েদের নিজের মনের মতো করে মানুষ করার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এতকিছু ভাবা বা করা সত্ত্বেও সত্যবতীর শেষ রক্ষা হল না। কোনো এক সময়ে সত্যবতীর একমাত্র মেয়ে সুবর্ণলতা সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। সেই সুযোগে সত্যবতীর শাশুড়ি সুবর্ণলতার বিবাহ দিয়ে দিয়েছিল নিজের মনোমত পাত্রের সঙ্গে। সত্যবতীর অনুমতি না নিয়েই। এরপর সত্যবতীর স্বামী ও শাশুড়ির নানা প্রচেষ্টা সত্যকে ভুল প্রমাণিত করার এবং সকলেই ব্যর্থ হয়ে অবশেষে "এই জন্যেই বলে মেয়ে মানুষের বিষয় সম্পত্তি থাকতে নেই। বাপের দলিলের ভরসা রয়েছে তাই স্বামীর অন্ন ত্যাগ দিয়ে চলে যাবার সাহস! মেয়েমানুষের এত সাহস ভাল নয়। এই আমি বলে দিচ্ছি। অশেষ দুঃখ আছে তোমার কপালে! স্বামী হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি তোমায় আমি!"[৮] এইভাবে ভর্ৎসনা করেও সত্যবতীর দৃঢ়চেতা মনকে তাদের চিন্তার গণ্ডীতে আনতে পারে নি নবকুমার। উপন্যাসের শেষে সত্যবতী কাশীর পথে যাত্রা করেন এবং জীবনের জমে থাকা প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেন শাস্ত্র ও পণ্ডিতদের নিকট হতে, তাই সত্যবতীর মুখে আমরা শেষ একটি সংকল্প শুনতে পাই, "হ্যাঁ, যাবো কাশীতে বাবার কাছে। সারাজীবন ধরে অনেক প্রশ্ন জমিয়ে রেখেছি, আগে তার উত্তর চাইতে যাবো"।[৯]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে একটি বিবাহ ঘটে গেছে প্রায় রূপকথার মতো— নবকুমারের শিক্ষক ভবতোষের সঙ্গে সত্যবতীর পালিতা কন্যা সুহাসিনীর বিবাহ, বৃদ্ধ শিব আর তরুণী উমার বিবাহের সঙ্গে যার তুলনা দিয়েছিল সত্যবতী। এই একটিমাত্র বিবাহই ঘটেছে নারীর ইচ্ছায়, নারীর সক্রিয়তায়, কিন্তু সত্যবতী চিরকালের জন্য হারিয়েছে বিবাহিতা সুহাসিনীকে।

সত্যবতীর দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের সঙ্গী নবকুমার, কোনোদিনই তার মনের দোসর ছিল না ঠিকই, কিন্তু এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা তার কাছেও আশা করে নি সত্যবতী। অসুখের ঘোরে নবকুমারকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে চেয়েছিল সত্যবতী— বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে সুবর্ণলতাকে যেন বাঁচায় নবকুমার, উত্তেজিত স্বরে বলেছিল— সুবর্ণকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে হাজার হাজার সুবর্ণকে, কিন্তু তখন নবকুমার ভেবেছিল— পাগলের সঙ্গে চাতুরিতে দোষ নেই। এইরকম পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপরই দাঁড়িয়েছিল তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক, তাই মা এলোকেশীর চাপের কাছে হার মেনে ন'বছরের বেথুন-স্কুলে-পড়া মেয়ের বিয়ে দিতে বসে স্ত্রীর মনের কথাটা মনেই পড়ল না তার, মূল্য পেল না স্ত্রীর আকুল আকাঙ্খা। কাশীতে নানা শাস্ত্র পড়ে সত্যবতী বুঝতে চেয়েছে— "...এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন, পুরুষের পক্ষে 'বিবাহ' একটা ঘটনামাত্র, অথচ নারীর পক্ষে চির অলঙ্ঘ্য কেন...",[১০] অন্বেষণ করতে করতে অবশেষে বুঝেছে— "...এর উত্তর পুরুষ দিতে পারিবে না, ভবিষ্যৎ কালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লিখিয়া দেয় না। ... স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে

স্ত্রীজাতিকেই।"[১১] সত্যবতীর গল্প দিয়ে যা শুরু, সুবর্ণলতার গল্পে তা শেষ নয়। 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'।

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, নারীর নিজের লেখনিতে পরিবারের যে চিত্র পাওয়া যেতে পারে তা কখনো কোনো সরকারি দলিলে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ হৃদয়ের এত ভিতর থেকে যে লেখনীর সৃষ্টি তাতে, আবেগ যেমন থাকে, তেমনই অনেক না বলা ইতিহাসেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশ:

১. Bhattacharyya, Sabyasachi, (2014). *The Defining Moments in Bengal (1920-1947)*, Oxford University Press, p. 47.

২. Engels, Frederick, (1975). *The Origin of the Family, Private Property and the State*, International Publication, p. 18.

৩. দেবী, হেমাঙ্গিনী, (২০০৪), *মনোরমা*, দে'জ, পৃ. আখ্যায়িকা।

৪. দেবী, আশাপূর্ণা, (২০০৬), রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ২।

৫. *তদেব*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬।

৬. *তদেব*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১।

৭. *তদেব*, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫।

৮. *তদেব*, নবম খণ্ড, পৃ. ২৩০।

৯. *তদেব*, নবম খণ্ড, পৃ. ২৩২।

১০. দেবী, আশাপূর্ণা, (২০০৬), *সুবর্ণলতা*, দে'জ, পৃ. ২৮২।

১১. *তদেব*, পৃ. ২৮৩।